ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী

ভূমিকা

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, 19 শতকের ভারতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, একজন বহুমুখী পণ্ডিত এবং সমাজসংস্কারক ছিলেন। যার অবদান ভারতীয় সমাজ এবং শিক্ষার উপর একটি অমোঘ চিহ্ন রেখে গেছে। যিনি দুর্লভ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের অধিকারী, তিনিই বাঙালির চিরগৌরব 'বীরসিংহের সিংহ শিশু, বিদ্যাসাগর বীর'।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য ছিলেন।তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দোপাধায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। দারিদ্র্য তাঁকে কখনো দরিদ্র করেনি। বরং, এর মধ্য দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন এক অনন্যসুলভ মনুষ্যত্ব।

বাল্যকাল ও শিক্ষা

গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র আট বছর বয়সে দরিদ্র পিতার হাত ধরে পদব্রজে কলকাতায় এলেন। পাঠশালায় ভর্তি হলেন। পড়াশুনোয় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান। যে-কোন প্রতিকূলতাকে তিনি দুর্জয় জেদে জয় করলেন। ন-বছর বয়সে ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজে। শুরু হলো বিদ্যার্জনের কঠোর সাধনা। একদিকে দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা, অন্যদিকে সুগভীর অধ্যায়ন স্পৃহা। দারিদ্র্য হলো তাঁর অঙ্গের ভূষণ। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পেলেন বৃত্তি। অসামান্য কৃতত্ব প্রদর্শন করে তিনি 'হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অভিনন্দি হনেল 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে। শুধু সংস্কৃত নয়, ইংরেজীও তিনি শিখেছিলেন কঠোর অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে।

কর্মজীবন

এবার কর্মজীবনের পালা। প্রথমেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিতের পদ প্রাপ্তি। অল্প পরেই সংস্কৃত কলেজে যোগদান। সময় ১৮৫০ সাল। প্রথমে সাহিত্যের অধ্যাপক। পরে ওই কলেজেরই অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হলেন ১৮৫১ সালে। এখানেও তাঁর আপসহীন সংগ্রাম। তখন সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণেরই একমাত্র প্রবেশাধিকার। তিনি সেই বাধার প্রাচীর ভেঙে দিলেন। জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য দূর করে সকলের প্রবেশাধিকারের পথ উন্মুক্ত করেদিলেন। সেই সঙ্গে কাঁধে নিলেন স্কুল-পরিদর্শকের অতিরিক্ত দায়িত্বভার। আট বছর দক্ষতার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে কাজ করলেন। ১৮৫৮ সালে কর্মত্যাগ করলেন। প্রবেশ করলেন বৃহত্তর কর্মজীবনে। কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠা করলেন মেট্রোপোলিটন ইনস্টিটুশ্যন্।

শিক্ষাবিস্তার

BANGLAESSAY.COM

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে জাতির অগ্রগতির পথ যেখানে রুদ্ধ, সেখানে শিক্ষার জ্যোতির্ময় আলোক বিচ্ছুরণেই জাতির চিত্ত-মুক্তি ঘটবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর শিক্ষাই তমসাচ্ছন্ন জাতিকে নতুন আলোকিত প্রভাতের সিংহদ্বারে নিয়ে যাবে। তখনই হবে বন্ধনমুক্ত মানবিকতার নব সূচনা। তাই, দেশময় শিক্ষাবিস্তারের জন্যে তাঁর মনপ্রাণ অস্থির হলো। গ্রামে গ্রামে তিনি স্কুল-প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করলেন। ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাধীনবাবে স্থায়ী করবার জন্যে বিদ্যাসাগরই এদেশে প্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু পুরুষ-সমাজেই নয়, নারী-সমাজেও শিক্ষা-বিস্তার ছিল তার সমাজ-সংস্কারের অন্যতম মহৎ কীর্তি। দেশে তিনি বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

বাল্য-বিবাহ নিবারণ

তিনি তো শুধু বিদ্যার সাগরই ছিলেন না, তিনি যে দয়ার সাগরও । রামমোহন সতীদাহ-প্রথা নিবারণ করেছিলেন। তবু নারী-সমাজের দুঃখ-লাঞ্ছনার অবসান হলো না। কৌলিন্য ও বহুবিবাহ-প্রথা এখনও এক সমাজ-ব্যাধি বাধাহীন। সমাজের আনাচে কানাচে ব্যভিচারের প্রমত্ততা। ঘরে ঘরে অসহায় ক্রন্দন। জননী ভগবতীদেবী একদিন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পুত্রকে বললেন, "তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই বিদ্যাসাগর বিচলিত হলেন। 'মাতার পুত্র উপায়-আন্বেষণ প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে প্রতিকারের শাস্ত্রীয় সমর্থন উদ্ভাবিত হলো। রক্ষণশীল সমাজ গড়ে তুলল প্রবল প্রতিরোধ। তাঁর প্রাণ সংহারের চেষ্টা চলল। তিনি অবিচল। অবশেষে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হলো। সময় ১৮৫৬ সাল। বিধাবা-বিবাহ প্রবর্তন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাল্য-বিবাহ নিবারণও ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম মহৎ ব্রত ।

সাহিত্য-কীর্তি

বিদ্যাসাগর ছিলেন, 'বাংলা ভাষার যথার্থ শিল্পী। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যে 'কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'শকুন্তলা', 'বর্ণ-পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি এক অসাধারণ প্রাণ-সমৃদ্ধ বাংলার গদ্যকে তিনি অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার থেকে মুক্ত করেছেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে সুনিয়ম ও একটি ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন। গদ্যকে করেছেন গতিময়। গদ্যের মধ্যে রক্ষা করেছেন একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত।

উপসংহার

এভাবেই জীবনভর যিনি ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ অসহায়দের ছিলেন আশ্রয়স্থল, যিনি এই দুর্বল ক্ষুদ্র কর্মহীন দাম্ভিক শুষ্কপ্রাণ জাতির মধ্যে করুণার প্লাবন এনেছিলেন, যিনি ছিলেন অখণ্ড পৌরুষের প্রতিমূর্তি, আজীবন অন্যায়-অবিচারে আপসহীন। আপামর বাঙালি জাতিকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে ১৮৯১ সালে ২৯ শে জালুই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক থেকে চির বিদায় নিলেন। নির্বাপিত হলো এক উজ্জ্বল দীপ শিখা।

BANGLAESSAY.COM

BANGLAESSAY.COM